লোকায়ত আঙিনায় উত্তরবঙ্গ

সম্পাদনা
দিলীপকুমার রায়
প্রমোদ নাথ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

চা বাগানে আদিবাসী লোকসংগীতে প্রতিবাদী চেতনা	অর্ণব সেন	২৫
ভাওয়াইয়া সংগীতের কাল নির্ণয় উদ্ভব এবং নামকরণ	হিতেন নাগ	৩০
উত্তরবঙ্গের মুখোশ নৃত্য	অভিজিৎ দাশ	৪০
টোটো উপজাতির সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত, ব্যাধি ও চিকিৎসা	বিমলেন্দু মজুমদার	৪৮
উত্তরবঙ্গের নদী সংস্কৃতি ও শেকড়ের সন্ধান	অশেষকুমার দাস	৬০
শেরশাবাদিয়াদের গান বা বাদিয়া গীতি	আবদুস সামাদ	৬৬
গ্রামবাংলার মুসলমান নৃত্যগীতি	আশা ফিরদৌসী	৭৫
গোর আজাবের মুর্শিয়া ঃ শ্রমজীবী মানুষের ধর্মীয় চেতনা	উমেশ শর্মা	৭৮
ধিমাল লোকনৃত্য ও লোক সংগীত (হেয়াকা লে)	গর্জনকুমার মল্লিক	৯১
লোকজীবনে লোকাচার ও লোকগান	জ্যোতির্ময় রায়	১০১
কোচবিহারের লোক বাদ্যযন্ত্র	ড. দিলীপকুমার দে	১১৫
উত্তরবঙ্গের লুপ্তপ্রায় ধিমাল সম্প্রদায়	ড. দিলীপকুমার রায়	১২৫
বলদিয়া সমাজ ও সংস্কৃতি	ড. দীপককুমার রায়	১৪২

'মেচ লোকসংগীত'	দ্বারেন্দ্র ঈশ্বরারী	১৪৬
টোটো ভাষা ও সংস্কৃতি	ধনীরাম টোটো	১৫৪
উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার	পরিতোষ দত্ত	১৬০
লোক-সাংবাদিকতা ও গম্ভীরা গান	পুষ্পজিৎ রায়	১৭৫
'তামাঙ' জনজীবনে পূজা-পার্বণ ও 'লোসার' উৎসব	প্রমোদ নাথ	১৮৭
গারো সমাজ ও সংস্কৃতি	বিমলেন্দু দাম	১৯৫
গারো জাতির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্ব	বেনেডিক্ট, এম, সাংমা	২০৭
ওরাঁওদের লোকসংগীত	রতন বিশ্বাস	২১৪
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি	সমিতকুমার সাহা	২২৩
রাভা-পরিবার সংগঠন	সুনীল পাল	২৪৩
'রাভা সমাজে নৃত্য-গীতের প্রাসঙ্গিকতা-ও নারীর ভূমিকা'	সুশীল কুমার রাভা	২৪৬
বোড়ো (মেচ্) জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতি	সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল	২৫৭
পশ্চিমবঙ্গে ডুক্‌পা জনজাতির উৎপত্তি সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক অবস্থান	সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	২৬৬
প্রাচীন কোচবিহারের অবলুপ্ত দেবদেবী	স্বপনকুমার রায়	২৭৮
পার্বত্যবঙ্গের লোকসংস্কৃতি	হরেন ঘোষ	২৮১

চা-বাগানে আদিবাসী লোকসংগীতে

প্রতিবাদী চেতনা

অর্ণব সেন

রহস্য-রোমাঞ্চ-নাটকীয়তায় ভরা ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কয়েকটি বইয়ের মধ্যে একটি 'মানদণ্ড ছেড়ে রাজদন্ড।' বণিক ইংরেজ ব্যাবসা ছাড়েনি, কিন্তু ক্রমে রাজদণ্ড তুলে নিয়েছে এদেশে। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৮-এ এদেশ থেকে বিলেতে চা রপ্তানির স্বপ্ন দেখেছিলেন। এদেশে চা চাষের শুরু, একের পর এক বাগিচার উদ্ভব, পূর্ব ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থাটাই বদলে দিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে। দার্জিলিং পাহাড়, তরাই অঞ্চল, জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্স, বাংলা ছাড়িয়ে আসামের নানা জায়গায় একের পর এক চা-বাগিচা গড়ে উঠল। এদেশে চা কেমন করে এল, চা কেমন করে কৃষিভিত্তিক শিল্প হয়ে দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তুলল, সেই দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্র এখানে নেই। তবে লক্ষ করার বিষয় এই যে, ১৮৩৯-এর ১২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত আসাম টি কোম্পানি পৃথিবীর প্রথম চা কোম্পানি, যার পরিচালক বা ডিরেক্টরদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং মতিলাল শীল। দার্জিলিং পাহাড় এলাকায় ১৮৫৬-তে ব্যবসাভিত্তিক চা-চাষ আরম্ভ হয়, পরে জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্স আসাম এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে চা-চাষের প্রসার। এখন বিহার, ওড়িশা, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, সিকিম, দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়ু প্রভৃতি প্রদেশ ছাড়াও কাছাকাছি নেপাল, বাংলাদেশেও চা-শিল্পের প্রসার ঘটছে। আবার কেনিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ছোটো চা-বাগিচা ছড়িয়ে পড়ছে দেশের নানা জায়গায়। (এ বিষয়ে 'দ্য অসম ডাইরেক্টরি' দেখা যেতে পারে)।

এখানেই উল্লেখ করা যায়, জলপাই-ডুয়ার্স বা ব্যাপকতর উত্তর বাংলার চা-বাগিচা পত্তনের প্রথম পর্বে স্থানীয় মেচ, রাভা, টোটো, গারো, রাজবংশী ইত্যাদি কৃষিনির্ভর অদিবাসীরা আসেননি। দার্জিলিং এলাকায় চা-বাগিচায় কিছু নেপালি শ্রমিকদের পাশাপাশি লেপচা, লিম্বু প্রভৃতি পাহাড়ি মানুষ এসেছিলেন। বিপুল পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজনেই আড়কাঠির মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশ, ছোটোনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, ওড়িশা, এমনকি আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশ, মুম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে সর্দার ও এজেন্টদের মাধ্যমে দালালি দিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করা হত। ১৯০৭ সালে জলপাইগুড়িতে বাগান ছিল ১৮০টি,

১৯০৫-এ দার্জিলিং-এ বাগান ছিল ১৪৮টি। ১৯১১-তে ভারতবর্ষে (অবিভক্ত) চা-বাগিচা ছিল ১,০০২ এবং সব ধরে কর্মী-শ্রমিক-কেরানি-ম্যানেজার নিয়ে ৭,০৩,৫৮৫ জন মানুষ কাজ করতেন।

শ্রমিক হিসেবে যাঁদের আনা হয়েছিল তাঁদের পশুর মতো এক জায়গায় আটকে রেখে চালান দেওয়া হত বাগিচা অঞ্চলে। ইমিগ্রেশন লেবার অ্যাক্টের ফাঁসে আবদ্ধ শ্রমিকদের পালিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। পালাবার চেষ্টা করলে, কাজে ফাঁকি দিলে বা অকারণেও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। রামকুমার বিদ্যারত্নের লেখা 'কুলি কাহিনী', 'চা-কর দর্পণ' ইত্যাদি ছাড়াও নানা লোকসংগীতে সেই মর্মান্তিক অত্যাচার ও বেদনার কথা আছে। আবার আছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিবাদের সুর। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'কুলির রক্ত চা।'

সাঁওতাল, খাড়িয়া, ওঁরাও, মুন্ডা, হো, ভূমিজ, গোন্ড, লোহার, কুর্মি, ভুঁইয়া, দোসাদ, চামার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের পুরোনো আবাস, অরণ্য ও কৃষিভূমি ফেলে এসেছিলেন নতুন উপনিবেশে। নতুন পরিবেশে আসার পর পুরোনো শিল্পকলা, গান, জীবনচর্যা একেবারে ভুলে যাননি মানুষ। তাই অবাঙালি ব্যাবসায়ী মহাজন, ঠিকাদারদের চক্রান্তের কথা স্মরণ করে লেখা হয়েছে প্রতিবাদী শ্রমসংগীত।

'কাঁহাকেক কুলি পানি কাঁহাকেক বাবুভৈয়া
লোহারদাগা ডিপুরে কুলি চালান করে
জঙ্গল কাঁইটকে মাটি কাঁইটকে বৈঠলেক ঘানি।
লোহারদাগা ডিপুরে কুলি চালান করে।'

কোথাকার মানুষ কোথায় এল! কোথাকার বাবুভাইয়া লোহারদাগা (রাঁচি) ডিপো থেকে কুলি চালান করল, আর জঙ্গল কেটে বসে গেল ঘানি, অর্থাৎ চা-পেষাই করার যন্ত্র! (সূত্র : সৈফুদ্দিন/বাগিচা শ্রমিকদের নয়া ইতিহাস রচনায় প্রবাহমানতা)।

মনে করিয়ে দিই, গত জানুয়ারি, ২০০৪-এ লোহারদাগার মানুষ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে, তাদের মেয়েদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্য দেশে চালান দেওয়া চলবে না। গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ।

আড়কাঠিরা চা-বাগিচাকে স্বর্গরাজ্য বলে প্রচার করত। তার নমুনা আছে গানে :

'আম ধরে ঝোপা ঝোপা
তেইতুল ধরে বেঁকা গ
পূরব দেশে গিয়াছিলাম
রাঁঢ়ির হাতে শাঁখা গ।'

তখন ডুয়ার্স বা তরাই ভয়াবহ অঞ্চল। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশা এবং অনেক অসুখ। চিকিৎসার সুযোগও কম। আবার নানা বন্যপশুর ভয়, তার চেয়েও ভয়াবহ ম্যানেজার বা কর্তৃপক্ষের অত্যাচার। পশুপতি মাহাতো 'ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবনে'

একটি গান তুলেছেন : 'চল মিনি আসাম যাব/দেশে বড় দুখরে/আসাম দেশেরে মিনি/চা-বাগান হরিয়াল। কোড়ামারা যেমন তেমন/পাতা তুলা কাম গো/হায় যদুরাম ফাঁকি দিয়ে/পাঠাইলে আসাম। সর্দার বলে কাম কাম/বাবু বলে ধরি আন/সাহেব বলে লিব পিঠের চাম রে যদুরাম ফাঁকি দিয়ে, পাঠালি আসাম।' (পাঠান্তরে 'শ্যাম')।

সেই বিশ্বাসঘাতক আড়কাঠি যদুরামের প্রতি তীব্র ঘৃণা এখানে প্রতিফলিত। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এশিয়ান ইমিগ্রেশন বিল পাশ করে। ফলে শ্রমিকরা তার বলি হয়ে রপ্তানি হতে থাকে। দারিদ্র আর অভাব এবং সেই সঙ্গে সরল বিশ্বাস ও অশিক্ষা শ্রমিকদের দুর্দশার কারণ। তাছাড়া ছোটোনাগপুর, রাঁচি, মানভূম প্রভৃতি এলাকা তীব্র অভাব আর দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষ ক্রমে ভূমিহীন সহজলভ্য শ্রমিক হতে বাধ্য হয়।

চা-বাগিচার প্রতিবাদী গানে অত্যাচারীকে শ্যাম বা নিঠুর বলা হয়েছে। এখানে লোকসংগীত রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রভাব আছে। সুখবিলাস বর্মা ঝুমুর গানের প্রভাব দেখেছেন।

'যার হাতে লাঠি ঠেঙা/তার হাতে ছল বারি
কলং-এ গিরিছে কারাগাড়ি/ওই রাইত বড়ো দিগদারি।'

আসামের কলং নদীতে কাদা আটকে যাওয়া মোষের গাড়ির অবস্থা শ্রমিকদের। আবার চা-বাগিচায় আটঘন্টা কাজের দাবিতে লোকনাট্য লেখা হয় রৌরেমন'। এর মধ্যেও থাকে প্রেম ভালোবাসা। প্রকৃতির সচেতনতা। 'গিরগিটি বিষম জ্বালা/আর গাঁথিব প্রেমের মালা গ/তোর সঙে বানাব প্রেমের ডোলনা/আর সখি যাতে দিব না।'

এইসব অত্যাচার-অবিচার-শোষণ চলতেই থাকে। শুধু বিদেশি নয়; দেশি মহাজন মালিকরাও কম ছিল না। ইংরেজদের অভিনব শাস্তি ছিল 'হপ্তাবাহার'। শাস্তি হিসেবে এক সপ্তাহের জন্যে খালি হাতে বাগিচা এলাকার বাইরে থাকতে হত। এছাড়া ছিল চাবুক আর মার।

এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রমে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে। জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্স বা দার্জিলিং-তরাই অঞ্চলে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্রমে শ্রমিক-কৃষক-রেলশ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক পর্বের শেষ দিকে বিশ শতকের চল্লিশ দশকে চা-শ্রমিক, কৃষক আর রেলশ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা দোমোহনিতে। তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ দেবীগঞ্জ-পচাগড়-বোদো আলোড়িত করেছিল তার আগে। প্রাণ দিয়েছিলেন মানুষ। চা-শ্রমিক, আধিয়ার, রেল-শ্রমিক আর নানা জাতি-জনজাতির কৃষকের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। (দ্রষ্টব্য : রণজিৎ দাশগুপ্ত রচিত বই Economy, Society and politics in Bengal : Jalpaiguri 1869-1947।

লাল শুক্রা লিখলেন : 'হাওয়া চলে সরসর/লাল ঝাড়া উড়ে ফরফর/চল কিসান চল মজদুর নিকালিনা যান্ কিরে/লড়াইকে ময়দান।'

ইংরেজ প্রথম চায়ের নেশা ধরিয়েছে দেশের মানুষকে, শ্রমিকদের ধরিয়েছে মদ, গাঁজা ইত্যাদির নেশা।

'রাহের সিজা ডিংলা কাটা যাবি না রে মন
কুলি চলিল রে, জনমের মতন।'
শোষণের কথা আছে একটি গানে :
'লাহুকে পানি খাইকে/পয়সা কমাইলি হায় রে
ওহি জায়গায় বাঙেল বলাইলি/মজদুর রহল ভাঙা ঘরে।'

এমন গান আরও আছে, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তুলে ধরেন লাল শুক্রা।

'গরম লাগলে পঙ্খাকে চলালি
ঠাণ্ডা লাগলে চুল্হাকে জ্বলালি
মজদুর বুঢ়া সময় ঘর খালি ভেল্।'

অতীতের চা-বাগান : লাঞ্ছনার লীলাভূমি' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন সৌরেন বসু। সাংবাদিক নৃপেন বসু লেখেন : 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশের আলোর পথযাত্রী।' তাঁর মন্তব্য : 'চা-বাগানে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজনেরা চা-বাগিচার জীবনের মধ্যে অরণ্যের ছোঁয়াচ পেয়ে থাকেন।' তাঁর মতে তাদের জীবনের সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির পুরোনো সংযোগ একেবারে ছিন্ন হয় না। তবে এখন দূরদর্শন ও সিনেমা নির্ভর সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব সবকিছু ওলটপালট করে দিচ্ছে সর্বত্রই। নতুন সহস্রাব্দে বিপন্ন চা সম্পদ এবং সংস্কৃতি।

ডোমকচ নাচের একটি গান সুবোধ সেন সংগ্রহ করেছিলেন

'মাটির মাদর করে পুকর/কা ঝুমঝুম করে
ঝুটি আশাবাদে লাগি/নিদ্ নাহি।'

১৯৪৬-এ গণনাট্য সংঘের বিজয় রায় গাইলেন :

'হামার দেশমে আকে/হামারা পাসা খাকে
আঁখ না দিখানা/হো না দিখানা।' (সূত্র : পরিতোষ দত্ত)

অশোককুমার অভিনীত হিন্দি ছবি 'কিসমত'-এর গানের অনুকরণে নেপালি শ্রমিক গেয়েছেন :

'দূর হাটো হো দুনিয়াওয়ালে/হিন্দুস্থান হামারা হায়।'

মহিলা শ্রমিককে সন্তান পিঠে নিয়ে যেতে হয় পাতিতোলার কাজে। তার পরিচয় আছে গানে :

'পিঠামে বালক ছোয়া/মুরমে টুকরি হায়রে/রদে বরকনে ভায়া, পাতা তুরালি।' রোদে-বৃষ্টিতে শিশুসন্তান পিঠে পাতা তুলতে হয়।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে আছে সাহেবদের চরিত্র, মদ খেয়ে বোতল ছুঁড়ে মারার কথা:

'চিরিপ চিরিপকে বাগিচার চাহাবাট'
চরাপ খাই পেলালে চিচা।'

লাল শুক্রার প্রতিবাদ গানে আছে—'লাল ঝান্ডা হায় তু'হারা নিশান/আগে বার হো আগে বার হো/আগে বার হো আগে বার হো/দুনিয়াকা জনতা।'

এভাবেই চা-শ্রমিকের প্রতিবাদ কৃষকের প্রতিবাদে মিশে যায়।

তেভাগার গানে পাই :

'দিনের শোভা সুরজরে
রাইতের শোভা চান্
হালুয়ার শোভা হালকৃষি
জমিনের শোভা—ধান।' [পাঠান্তরে 'শোবা']

চা-বাগিচার লোকায়ত সংস্কৃতিচর্চার ধারাটি আজ নানা কারণেই বিপন্ন ও বিপর্যস্ত। শুধু বহিরাগত দূরদর্শন ও চলচ্চিত্র নির্ভর সংস্কৃতিই নয়, বিশ্বায়ন এবং বাজার অর্থনীতি লোকায়ত সমাজের শেকড় উপড়ে ফেলতে চায়। ফলে চা-শ্রমিকেরা যখন তাদের প্রথম বাসভূমি ত্যাগ করে দ্বিতীয় জন্মভূমি হিসেবে চা-অঞ্চলকে গ্রহণ করেছিলেন তখন পর্যন্ত তাঁদের সংস্কৃতি চর্চার ধারাটি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি। ইদানীং একের পর এক চা-বাগিচা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর্থিক সংকটে, আবার অনেকক্ষেত্রে, মালিকপক্ষের অশুভ চক্রান্তে। তবে বাজারে চায়ের দাম কমেনি। তবু বিপন্ন চা-বাগিচা নির্ভর লোকায়ত সংস্কৃতির ধারাটি। কর্মহীন দিশাহারা শ্রমিকের লোকায়ত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কি আবার আমরা শুনতে পাব? চা-বাগিচায় বিভিন্ন জাতি-জনজাতির বাস বলেই এখানে নানা সংস্কৃতি ও ভাষার মিশ্রণ অনিবার্য। আবার জীবিকাসূত্রে এখানে কিছু শিল্প নির্ভরতা ও ঐক্য থেকে যায়। এখানকার লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য, মিশ্রণ এবং বৈপরীত্য অনিবার্য। ফলে এখানকার লোকায়ত সংস্কৃতিচর্চার মধ্যেও আছে ব্যাপকতর জটিলতা এবং বহুমাত্রিক বিশালতা।